সমকাল

তারিখ ... 27 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা নিয়ে যত দুর্ভাবনা

উন্নয়ন | আমিরুল ইসলাম খান

| শিক্ষাবিদ

শিক্ষা যদি মানবিকতা ও দক্ষতা বিকাশের সোপান বলে স্বীকৃত, তবে কবুল করা ভালো– আমরা আছি তা থেকে যোজন যোজন দূরে। কথাটি তিক্ত, কারও কারও কাছে অগ্রহণযোগ্য, বিশেষত গলাবাজি আর তোষামোদিতে ওস্তাদ যারা তাদের কাছে; কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য। আমরা না পেরেছি শিক্ষার মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ ঘটাতে, না পেরেছি দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে। চোখ বন্ধ করলে প্রলয় বন্ধ হয় না।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষার লাখো তনখার মনসবদারের প্রিয় উপহার দুটি। প্রথমটি, তারা গোটা শিক্ষাকেই নাকি 'সৃজনশীল' করে ফেলেছেন এবং দ্বিতীয়টি হলো 'মুখস্থকে নির্বাসন' দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ দুই ধন্বন্তরী প্রয়োগে তারা বাংলার শিক্ষাকেই 'দুনিয়ার সেরা' ব্র্যান্ডে রফতানিযোগ্য পণ্য বানিয়ে ছেড়েছেন।

প্রথমেই 'সৃজনশীল শিক্ষা' কী তা একটু জেনে নিলে ভালো হয়। বিদেশি গবেষকরা তাদের এক প্রকল্প কোথাও গেলাতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশে এসে তার গতি করে হাঁফ ছাড়েন এক দশক আগে। অনেক 'বড় টাকার' প্রকল্প। সেই মহাজনরা আবিষ্কার করলেন– এ দেশে পাবলিক পরীক্ষার ফলে মোটা ফাঁক। কোনো পরীক্ষার্থীই ২৯-৩২, ৩৮-৩৯, ৫৮-৫৯ ইত্যাকার প্রান্তিক নম্বর পায় না। তারা আরও দেখে অবাক হলেন, একই উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষকের মূল্যায়নে অভাবনীয় পার্থক্য ঘটে। শুধু তাই নয়, একই উত্তরপত্র একই পরীক্ষকের কাছে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভিন্ন মানে মূল্যায়িত হয়! এসব গোলকধাঁধার জবাব পেতে দেখা গেল এই ভৌতিক মান প্রযোজনায় কর্তৃপক্ষীয় 'নির্দেশনা' কাজ করে। আর মূল্যায়ন পদ্ধতি এতটাই ব্যক্তি-ইচ্ছানির্ভর যে, কোনো মূল্যায়নই নির্ভরযোগ্য হয় না। এসবের বিলোপ সন্ধান করতে অনেক গবেষণা করে তারা যে দাওয়াই আবিষ্কার করেন, তা হলো 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন'।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মূলনীতি হলো, উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকের 'ব্যক্তিক স্বাধীনতার সীমানা' কমিয়ে আনা। প্রস্তাব করা হলো– প্রশ্নই করা হবে এমনভাবে যার উত্তরে পরীক্ষক একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থেকে নম্বর দেবেন। একটি অজানা 'উদ্দীপক' দিয়ে চারটি প্রশ্ন করা হবে, যা হবে জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার চার স্তরে বিভক্ত। প্রতি ধাপের নম্বর বিন্যাস করা হলো যথাক্রমে ১+২+৩+৪ মোট ১০। উদ্দীপক পাঠ করলে বিদ্যার্থী ১-৩ ধাপ পর্যন্ত উত্তর দিতে পারবে উদ্দীপকের মধ্য থেকেই দেখে দেখে। সেখানে তার ১+২+৩= ৬ নম্বর পাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাবে। এবার যদি কেউ চতুর্থ প্রশ্নের জবাব নাও দিতে পারে তবু সে পাবে অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর। এ পদ্ধতি এতটাই 'কাঠামোবদ্ধ' যে, পরীক্ষার হলে উদ্দীপক থেকে কয়েক লাইন দেখে দেখে লিখে দিতে পারলে এখন ফেল করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে, আর পরীক্ষকের ইচ্ছানির্ভর নম্বর দেওয়ার 'ব্যক্তিক ভূত' বিতাড়িত হবে।

কিন্তু বাঙালি পণ্ডিতকুলের এক 'গণপ্রিয়' অংশ তাতে প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। তাদের যুক্তি– জ্ঞান হবে স্বাধীনসত্তার এমন এক অসীম বিকাশ সাধন, যা কোনো খাঁচায় আবদ্ধ করা চলবে না। তারা 'কাঠামোবদ্ধ' শব্দবন্ধের প্রতি তীব্র ঘৃণা ছড়িয়ে দিলেন দেশব্যাপী। মোক্ষম যুক্তি পেয়ে নাগরিককুলের একাংশ 'না, না' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস তপ্ত করে তুললেন। তিরিশ পিপি নস্যি টেনে বুদ্ধিমানেরা সে মহাসংকট থেকেও জাতিকে উদ্ধার করলেন। তারা বললেন, জ্ঞানের বাতায়ন সদা উন্মুক্ত থাকবে। সেখানে জ্ঞান অসীম সম্ভাবনা, আর, সৃজন-সক্ষমতায় সদা উপস্থিত হবে নবসৃষ্টির নবকৌশলে। বিতাড়িত হলো 'কাঠামোবদ্ধ' নামক অর্বাচীন শব্দবন্ধ।

খাঁচায় আবদ্ধ পাখি রাতারাতি হলো মুক্তবিহঙ্গ, অসীম নভোচারী 'সৃজনশীল'।

বাঙালি স্বভাবকবি। সৃজনশীলতায় বাঙালির তুলনা শুধু বাঙালিই। 'কাঠামোবদ্ধ' শব্দবন্ধকে তুড়ি মেরে ফেলে দিয়ে এক মোহনীয় নামে হাজির করা হলো সেই কাঠামোবদ্ধ তত্ত্বকেই। নতুন বোতলে আমদানি করা সেই পুরাতন পরিত্যক্ত সর্বরোগহর ব্যবস্থা, 'সৃজনশীল প্রশ্ন' যার অফিসিয়াল নাম। বিধান জারি হয়ে গেল। বিরোধিতাকারী সেই পণ্ডিতকুল এবার জয়ধ্বনি দিলেন। শুরু হলো মহাধুমধামে তার বাস্তবায়ন। নামের এমন মাহাত্ম্য বাঙালি পূর্বে কখনও দেখেনি। যা ছিল 'কাঠামোবদ্ধ' এবং সে কারণে 'ম্লেচ্ছ', 'অস্পৃশ্য' তা-ই রাতারাতি 'সৃজনশীল' তকমায় রফতানিযোগ্য শিক্ষাপণ্যে পরিণত হলো। উদ্বাহু নৃত্যে মেতে উঠলেন পণ্ডিতকুল!

ঢোল পিটিয়ে বলা হলো– বই দেখে নকল করার দিন শেষ। কারণটাও জানান দেওয়া হলো– বই থেকে কোনো প্রশ্নই পড়বে না পাবলিক পরীক্ষায়। পরীক্ষার্থীরা এমন অভিনব বিদ্যায় পারদর্শী হবে যে, দুনিয়ার তাবৎ প্রশ্নের জবাব সে পরীক্ষার হলে বসেই তাৎক্ষণিক আবিষ্কার করে ফেলবে এবং তৎক্ষণাৎ সে সব অভিনব উত্তর লিখে ভরিয়ে ফেলবে উত্তরপত্র; তা পরীক্ষার্থীর বয়স ১০ বছরই হোক, কিংবা ১৬! আর পাবে অভাবনীয় উচ্চ নম্বর। ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া হয়ে পড়ল নস্যি! বঙ্গে পণ্ডিতের বান ডাকল। পাবলিক পরীক্ষায় হালে অতি উচ্চ হারে পাস ও সোনালি ফলের আসল মাজেজা হলো 'সৃজনশীল' প্রশ্নের নম্বর প্রদানের নতুন তরিকা।

তাৎক্ষণিক ফল ফলতে শুরু হলো। বিদ্যার্থী বুঝল, তারা এখন শুধুই 'পরীক্ষার্থী'। বই না পড়লেও চলে। ফলে পাঠ্যবই উঠল শিকেই। শিকেই উঠল ভাষা শিক্ষা। কিন্তু সম্মুখে তার হাজির হলো পরীক্ষা নামের দৈত্য। তারও নিদান পাওয়া গেল অচিরেই। বাজার সয়লাব হলো গাইড আর নোটে। এদিকে সরকারি ফরমানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড, নোট নিষিদ্ধ। আইনবাজরা তারও সমাধান করে নিলেন নিমিষেই। তারা বললেন, 'কই, আমরা তো পাঠ্যবইয়ের কোনো গাইড বাজারজাত করিনি! আইন ভাঙিনি। সৃজনশীল বই প্রণয়ন করে তা বাজারে দিয়েছি গোটা জাতিকে সৃজনশীল করার মহান ব্রতে।' মোক্ষম জবাব। সুতরাং কাজির হাত খাটো হলো আইনের খঞ্জরে।

হুকুম জারি ছিল আগেই– বই থেকে প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু বাজার যে সয়লাব সৃজনশীল পুস্তকে! অসীম সংখ্যক বইয়ের কেরামতি আর মুক্তবাজার অর্থনীতির খঞ্জর উঁচিয়ে এবারও পার পেলেন পরীক্ষা বাণিজ্যের বণিকরা। ওদিকে প্রশ্ন প্রণেতাদের পাঠ্যবইয়ের গতি নেই। সুতরাং যা খুশি প্রশ্ন সেট কর।

আশা করি বেয়াদবি মাফ করবেন, যদি সৃজনশীলের দুয়েকটি নমুনা হাজির করি। উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলা প্রশ্নপত্রে সেবার গলা পানিতে ডুবে বাঙালি কবি রবিঠাকুর আর জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পরস্পরকে বলছেন, 'দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।' এবার পরীক্ষার্থীকে বলতে হবে, কে কাকে কী বলছেন? ওদিকে রবিবাবু আর আইনস্টাইনের যে স্কেচ ছাপা হয়েছে প্রশ্নপত্রে তা দেখে খোদ রবিঠাকুরই নিজেকে চিনতেন কিনা সন্দেহ!। ভাবুন, 'সৃজনশীল প্রশ্ন' কোন স্তরে পৌঁছলে এমন নালায়েক প্রশ্ন করা সম্ভব! আরও কিছু প্রশ্নের নমুনা অনেকেই জানেন। একবার এক প্রশ্নকর্তা আমাদের দুই গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে সৃজনশীল প্রশ্ন করে চাকরি হারান। আবার ধর্ম নিয়েও নানা ঝামেলায় পড়েছেন কেউ কেউ। গণিত আর বিজ্ঞানের তেলেসমাতি যত কম বলা যায় ততই ভালো। তাহলে কি রাতারাতি আমাদের শিক্ষককুল প্রশ্ন বানানোর যোগ্যতাই হারিয়ে ফেললেন? সাম্প্রতিককালে কিন্তু নানা মহল থেকেই বলা হচ্ছে– প্রশিক্ষণ দিয়েও শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে যোগ্য করে তোলা যায়নি! কী সাংঘাতিক কথা! কিন্তু কেউ এজন্য 'সৃজনশীল প্রশ্ন' কী, সে সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেন না।

আমরা সেকেলে, তাই অসৃজনশীল। এক সাবেক শিক্ষা সচিব তো 'সৃজনশীল' প্রশ্নকে 'মরণশীল' বলেই আখ্যায়িত করেছিলেন! কেউ প্রশ্ন নিশ্চয় করতে পারেন– যে বিদ্যা আকাশচারী, যা অসীম সৃজনশীলতায় মহাশূন্য অভিযানের লক্ষ্যে আবিষ্কৃত হলো, তা এত অনাসৃষ্টি কাণ্ড করছে কেন?

'মুখস্থকে না বলা' আরেক মহাআবিষ্কার আমাদের। প্রাথমিক সমাপনী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শতকরা ৪০-৫০ ভাগ প্রশ্ন হলো শতভাগ মুখস্থনির্ভর। 'নৈর্বাচনিক' প্রশ্নের পুলসিরাত পার হওয়া রীতিমতো এক দুঃস্বপ্ন। 'মুখস্থ' না করলে কোনো উত্তরই সঠিক দেওয়ার রাস্তা বন্ধ। আবার চোখ বুজে টিক মারলেও পাস নম্বর পাওয়া যায়! কিন্তু সবাইকে সোনালি প্লাস পেতে হবে! এবার শিশুর ঘুম হারাম। সে ছুটল কোচিং সেন্টারে। সেখানে মুখস্থবিদ্যার অব্যর্থ দাওয়াই মিলল। এ রকম এক অনিশ্চিত যাত্রার জন্য বোধ হয় অপেক্ষায় ছিলেন পরীক্ষা-বণিকের দল। তাদের বাণিজ্যের পালে লাগল জোর হাওয়া। সে হাওয়ায় ফুলে-ফেঁপে উঠল কোচিং বণিকদের অর্থবিত্ত। গ্রামে ভিক্ষে করে খাওয়া মানুষের পোলাপানেরও মকসুদ মঞ্জিল হলো 'কোচিং সেন্টার'। মা-বাবা স্কুল-কলেজে হাজির হয়ে তাগিদ দেন– কোচিংয়ে যাবে তার সন্তান। আগেভাগে ছুটি দিতে হবে তাদের। ফলে স্কুল-কলেজ পরিণত হলো শিক্ষা বোর্ডে নাম লেখানোর কেন্দ্র আর কোচিং সেন্টারের দালালদের খদ্দের জোগাড়ের ভাগাড়ে।

নিন্দুক গবেষকরা আবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। পরীক্ষার হলে নৈর্বাচনিক পরীক্ষার উত্তর নিয়ে এমন সব তথ্য এসেছে যে, সমাপনীর পুলসিরাত পার হতে ১০ বছরের শিশুর পরীক্ষা হলেই অনৈতিক শিক্ষায় তালিম সম্পন্ন হচ্ছে। তারাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ।

সবার ওপর বিষফোঁড়ারূপে এসে হাজির হয়েছে প্রশ্ন ফাঁস। পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী থেকে রাষ্ট্রের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষা– কোথাও প্রশ্ন ফাঁস রোধ করা যাচ্ছে না! আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যেসব কাণ্ড শুরু হয়েছে তা নিয়ে রীতিমতো মহাভারত রচনা সম্ভব। ভাষা শিক্ষা, সৃজনশীল প্রশ্ন, ভর্তি পরীক্ষা, নোট গাইড ব্যবসা, কোচিং বাণিজ্য, প্রশ্ন ফাঁস শিক্ষা বিষয়ক ইত্যাকার কর্মকাণ্ডের নৈতিক ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণ এখন রীতিমতো গবেষণার বিষয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এসব বাণিজ্য করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা কোন নরকে পাঠাচ্ছি? এসব দুর্ভাবনার শেষ কোথায়?

নৈর্ব্যক্তিক, সামগ্রিক ও নির্মোহ মূল্যায়ন ছাড়া এসব সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই।

amirulkhan7@gmail.com